ঝরা বকুলের গন্ধ

ছান্দিক

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

লেখকের কথা

কোনো লেখাই, বিশেষভাবে মৌলিক কোনো লেখা নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে না। যে কোনো লেখার মধ্যে লেখকের বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়। লেখার মধ্য দিয়ে যে চরিত্রগুলো আঁকা হয়। সেই চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক তার বিশ্বাসকে রূপ দিতে চায়। আমি বিশ্বাস করি হাজার হাজার বছর ধরে যে দুটি মহান জাতি পাশাপাশি বাস করে ও একে অপরের কাছে আসতে পারল না, রয়ে গেল যোজন বিস্তর দূরে কেবলমাত্র নর-নারীর ভালোবাসার মধ্য দিয়ে, স্বাভাবিক আত্মীয়তার মধ্য দিয়ে, তার একটা সুন্দর পরিণতি ঘটানো সম্ভব।

তাই আমার বিভিন্ন লেখায় বারবার এসেছে নর-নারীর ভালোবাসার কথা। দুই ভিন্নধর্মের নর-নারীর ভালোবাসার উপর আমি জোর দিয়েছি এইজন্য নয় যে, তা সমাজে আকছার ঘটছে। ক্বচিৎ ঘটছে বলেই, আমি বিশ্বাস করি এটা যত বেশি ঘটবে ততই সমাজের মঙ্গল।

একদিন ভারতবর্ষে "হিন্দুধর্ম" একটা জাতিগত ধর্ম, এই সম্পূর্ণতা পাওয়ার আগে, শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-গাণপত্য ইত্যাদি যে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, সেখানে ছিল এই ভেদাভেদ। এ নিয়ে নীতির লড়াই, নিজেদের মধ্যে হানাহানিও কম হয়নি। কিন্তু আজ তা ইতিহাসের বিষয়বস্তু। আজ কোনো শৈব-শাক্ত বা বৈষ্ণব তার মেয়ের বিয়ে অন্য কোনো ... বিশ্বাসী ছেলের সঙ্গে দিতে আপত্তি করে না। কিন্তু একদিন তা অসম্ভব ছিল।

ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধুমাত্র কোনো একটি জাতির ধর্মীয় ইতিহাস নয়। এখানে এসেছে সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ তারপর তাদের সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে একটা সংস্কৃতি। তা কোনো ধর্মের নিজস্ব সংস্কৃতি নয়।

ইসলাম এদেশে আসার আগে পর্যন্ত যাঁরা যাঁরা এখানে এসেছেন তারা প্রায় সকলে স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে লীন হয়ে গেছে। কিন্তু ইসলামই একমাত্র ব্যতিক্রম। কেন এই ব্যতিক্রম তার ঐতিহাসিক পটভূমিকাই বা কি, সেসব এখানে আলোচ্য নয়। সম্প্রীতি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সামাজিক আদান-প্রদান এর মধ্য দিয়ে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও একান্ত একাগ্রতাবোধ গড়ে ওঠা সম্ভব বলে আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

আমি মনে করি সময়ের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা-ভাবনারও পরিবর্তন হয়ে চলেছে। সে ধর্মীয় চিন্তা সামাজিক চিন্তা বা সম্প্রীতিমূলক যে কোনো চিন্তা হোক না কেন।

আমি কাহিনিতে "জুরেখার" ভালোবাসাকে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে বিচার করেছি। যে সামাজিক শৃঙ্খলে বাঁধা আছে উভয়ধর্মের আচার-আচরণ তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এই যে দীর্ঘদিনের অপেক্ষা তা একটা সময়ের বিবর্তন মাত্র।

ভারততথা ভারতীয় উপমহাদেশে ছয়ের দশকের শেষ থেকে বিশেষভাবে ৬৭ সালের পর থেকে যে আমূল পরিবর্তন হয়ে চলেছে দ্রুত তালে, কখনওবা সামনে কখনওবা পিছনে তাকেই আমি ৩২ বছরের আয়নার ধরতে চেয়েছি।

হিন্দু মেয়েরা মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করে সুখী যেমন হয়েছে, সংঘাতও আছে, তবু তা সমাজে মোটামুটি ঘটে। যদিও হিন্দুসমাজ যে তাকে সুখী মনে মেনে নেয় তা নয়। কিন্তু মুসলমান

মেয়েদের বিধর্মীকে বিয়ে করা সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ। তাই কোনো বিধর্মী পুরুষ কোনো মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে তাকে ধর্ম ত্যাগ করেই করতে হয়। অবশ্য এটা ধর্মীয় নিয়ম না সামাজিক নিয়ম এটা অবান্তর। 'জুরেখা'র প্রতিবাদ এখানে, হয়তো ছান্দিকেরও। ধর্ম অন্তরের জিনিস, তাই নর-নারীর মিলন তো ধর্মের মিলন নয়। জুরেখার এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা, তার পরিবার চিন্তার পরিবর্তনের প্রতীক্ষা। নিজের ধর্ম সে যেমন ত্যাগ করবে না। তেমনি ছান্দিকও তার ধর্ম ত্যাগ করবে না, এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তারা পূর্ণতা চেয়েছে বলেই এই প্রতীক্ষা।

ছয়ের দশকের শেষ থেকে সারা পৃথিবীতে শুভকামী মানুষের চিন্তার জগতে যে পরিবর্তন এসেছে, দুটি জীবনের ভালোবাসার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দীর্ঘদিনের নীরব প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের মনের মধ্যে একে অপরের জন্য যে অনুভূতি যে ভালোবাসা সমস্তরকম প্রতিরোধকে অতিক্রম করে আজো বেঁচে আছে। তাকেই শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছি এই লেখায়।

আমি বিশ্বাস করি ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য সব ধর্মে এক। তা যেমন শাশ্বত, তেমনি তা 'সত্যম্ শিবম সুন্দরম', মানুষকে ভালোবাসাই সব ধর্মের মূল কথা। নর-নারীর ভালোবাসা তাকে শুধু মহিমান্বিত করতে পারে।

কলিকাতা - ১০১
ভি.আই.পি পার্ক

লেখক
(ছান্দিক)
৩১/৭/২০০২

ঝরা বকুলের গন্ধে

বেশ কিছুক্ষণ আগে সূর্য ডুবে গেছে। যদিও হেমন্তের বিকেল, তবু বেশ গরম, গায়ে কোনো পাতলা জামাও রাখা যাচ্ছে না, কোথাও এক বিন্দু হাওয়া নেই। দক্ষিনের বারান্দায় একাকী বসে বসে ধূসর বিকেলের রং দেখতে দেখতে আকাশ যে কখন অন্ধকারে ঢেকে গেছে বুঝতেও পারে না ছান্দিক। আলোটা জ্বালানো দরকার। কিন্তু ইচ্ছে করছে না। একাকী অতীত ভাবনায় মগ্ন হয়ে নিজেই নিজের কাছে জানতে চাইছে, কী হবে সেই অতীতকে নিয়ে টানাটানি করে। তার থেকে এই তো ভালো আছি। এই একাকী জীবন, একান্তভাবে ভালোলাগার দিনগুলোকে স্মৃতির রোমন্থনে কাটিয়ে দিয়ে এই পথ চলা, মন্দ কি! জীবন তো অভ্যেসের দাস। যা অভ্যেস হয়ে গেছে তাকে নিয়ে কাটিয়ে দেওয়াই তো ভালো। অভ্যেসও তো একটা টনিক. জীবনের টনিক, বেঁচে থাকার জন্য তার মূল্য তো কম নয়। ভাবতে ভাবতে মনে হয় ছান্দিকের একটা ঝড় উঠতে পারে না? এই সময় যে ঝড় উঠতে পারে না তাতো নয়। হেমন্তে তো এমন ঝড় বহুবার হয়েছে। ঝড় না উঠুক অন্তত হাওয়া তো হতে পারে। কে জানে আজকের বিকেলটা এত নির্দয় কেন?

আলোটা জ্বালিয়ে ফ্যানটা চালিয়ে দেবে কিনা ভাবছে। ভাবতে ভাবতে উঠে পড়ে। ঘরে গিয়ে আলো জ্বালায়। তারপর ভিতরে বাইরে সবকটা আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তার মনে হয় এ অসহ্য। এত আলো শুধু অসহ্য নয়, অপ্রয়োজনীয়। এক এক করে সবকটা আলো নিভিয়ে দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে আসে লনে। লাল সুরকি বাঁধানো লন। তার দু'পাশে যত্ন করে সাজানো বাগান। ফুল আছে। নিয়মিত বাগানের পরিচর্যা করে। কোথাও কোনো আগাছা জন্মাতে দেয় না।

সন্ধ্যার আকাশে যখন ভরা জোছনার ঢল নামে, তখন বাগানের নরম পেলবতা চোখকে আরাম দেয়। অনেকটা সময় পায়চারি করে করে কাটিয়ে দেয় ছান্দিক এই বাগানের মধ্যে।

ছান্দিক যখন এই বহুজাতিক কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার হয়ে জয়েন করে, তখন এই কোয়ার্টারের চেহারা এরকম ছিল না। জমকালো রং আর অজস্র গাছ দ্বারা সাজানো ছিল বাগান। ছান্দিক সেসব কেটে ফেলে মালিকে আদেশ করে কোনো বড় বা দামি গাছ নয়, বাগানটাকে সাজাতে হবে একেবারে আটপৌরে ফুলের গাছে। সারা বছর বাগানে ফুটবে মরসুমি ফুল আর তার নরম সৌন্দর্যে সবসময় জীবনটাকে মনে হবে তা শুধু শুকিয়ে যাওয়ার নয়। জীবনে যা হারিয়ে গেছে তাই সব নয়। জীবনের না পাওয়াটাও জীবনের এক মহার্ঘ সম্পদ।

কোয়ার্টারের গেটে কে জানে কেন ছান্দিক সেদিন দুটো বকুলের চারা আপন খেয়ালে লাগিয়েছিল, সেও তো হয়ে গেছে বহুদিন। সেই চারাগাছ বড়ো হয়েছে। যেদিন সেই গাছে প্রথম ফুলের কুঁড়ি এসেছিল কি অপার আনন্দ তাকে গ্রাস করে ফেলেছিল। তারপর যেদিন সেই কুঁড়ি থেকে ফুল ফুটেছিল সেকি আনন্দ ছান্দিকের। বিস্ময় যেন তার চোখ থেকে আর মুছতেই চায় না। এ যেন এক সৃষ্টির বিস্ময়। যে সৃষ্টি তার একান্ত নিজস্ব।

ভালোলাগা না লাগার অনেকগুলো মুহূর্ত সে এখানে কাটিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে ২/১জন পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি গেলেও সাধারণত নিজের কোয়ার্টার ছেড়ে সে কোথাও যেতে চায় না।

এমনিতে গম্ভীর ছান্দিক, তার আচরণে। তাই অফিসের কর্মীমহলে দাম্ভিক হিসাবেই তার পরিচয়। প্রয়োজন ছাড়া যে জীবনে অপ্রয়োজনের একটা মূল্য আছে তা যেন সযত্নে এড়িয়ে চলে ছান্দিক। এমন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া খুবই কষ্টকর।

তার উপর জুরেখার একটা চিঠি পেয়েছে কয়েকদিন আগে। তাই নিয়ে আরো গম্ভীর। সুদীর্ঘ ৩২ বছর পরে তার এমন একটা চিঠি লেখার দরকার কি ছিল? যেদিন তার জীবনে জুরেখার সত্যি সত্যি প্রয়োজন ছিল, সেদিন সে আসেনি। হয়তো আসতে চায়নি, অথবা সত্যি সত্যি আসার কোনো অসুবিধা ছিল। কিন্তু ছান্দিক প্রাণপণে তা ভুলে গেছে। জুরেখাকে মনে রাখবার কোনো চেষ্টাও সে করেনি। চিঠিটা না এলে সে হয়তো জানতেও পারত না জুরেখা নামের মেয়েটি আছে তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে।

বেশ কয়েকবার পড়েছে চিঠিটা। আর অতীত যেন তার সমস্ত অস্তিত্বকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে গেছে। এ চিঠির কি উত্তর দেবে সে। কেমনভাবেই বা দেবে।

যতই ভেবেছে চিঠিটার কথা, ততই যেন গম্ভীর হয়েছে ছান্দিক। একবার ভেবেছে একটা কড়া উত্তর দেবে, যাতে তার নিস্তরঙ্গ জলে আবার যেন কোনো ঢেউ তোলার সাহস না পায়। আবার কখনওবা ভেবেছে কি হবে কড়া কথা শুনিয়ে। কোনো জীবনই তো কোনো জীবনের কাছে দাসখত লিখে দেয়নি। জুরেখার যা ভালো মনে হয়েছে জীবনকে সে যেমনভাবে বুঝেছে, আর আজও যেমনভাবে পেতে চায় তেমনভাবে লিখেছে। তার এই ভাবনাকে আঘাত দিয়ে কি লাভ? তার থেকে থাক না পড়ে ওর চিঠি যেমন আছে তেমনিভাবে। জীবনের অনেক স্মৃতি যেমন হারিয়ে গেছে, এটাও না হয় হারিয়ে যাক তেমনি একদিন।

মনের ভিতরকার চিন্তা থমকে দাঁড়ায়, এক ঝলক হিমেল হাওয়ায় ভর করে আসে যখন বকুলের সুরভি গন্ধ। আঃ কি আরাম! এইতো একটু আগে এক দম বন্ধ করা গরমে ভ্যাপসা হতে হতে মনে হচ্ছিল প্রকৃতি যেন নিষ্ঠুর নিয়তি। আর মুহূর্তের একঝলক হিমেল হাওয়া তার চিন্তা ও চেতনায় যেন নাড়া দিয়ে গেল। মনে হল কেন হারানো অতীতের মাঝে নিক্ষেপ করবে আজকের জুরেখাকে। সে তো শুধু অতীতের স্মৃতিচারণা করেনি। সেকি চায় তাও তো বলেছে। তার চাওয়ার সঙ্গে নাইবা মিলল ছান্দিকের চাওয়া। তাই বলে সে কেন উত্তরে জানাবে না জুরেখার চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার।

ঠান্ডা বাতাসটা একঝলক দেখা দিয়ে মুছে যায়নি। সে আছে প্রবলভাবে, আর তার গতি মন্থর। আর তাইতেই মনটা কেন যেন ভালো হয়ে যায় ছান্দিকের, আর এই ভালোলাগা মনটা নিয়েই তো জুরেখার প্রতিটি কথার উত্তর দেওয়া যায়।

লনের শেষপ্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে আসে ঘরে। জ্বালায় আলোটা। তারপর দরজা খুলে বসে বাইরের বসার ঘরে। খুলে দেয় দক্ষিণের জানলাটা। সেখান থেকে লনটা স্পষ্ট দেখা যায়। ঘরের কোনো আলো না জ্বালিয়ে টেবিলল্যাম্পটা জ্বালিয়ে নেয়। তারপর চেয়ারে বসে টেনে নেয় লেখার প্যাডটা। হাতে কলম নিয়ে ভাবে কীভাবে সম্বোধন করবে তাকে। অনেক কাব্যিক সম্ভোধন মনে এলেও শেষ পর্যন্ত শুধু লেখে 'প্রিয় জুরেখা' এই লেখার পরে প্রথম যে লাইনটা মনে আসে তাই লিখতে গিয়ে ভাবে এটা কি সত্যি কথা? তারপর দ্বিধা ঝেড়ে মনে মনে ভাবে সত্যি না হলে মনে আসবে কেন? মনে মনে ঠিক করে, মনে যা আসে তাই লিখবে ছান্দিক। কোনো যুক্তি দিয়ে তার কোনো পরিবর্তন করতে চাইবে না। তাই তো মনে যা এসেছিল তাই দিয়ে লিখতে আরম্ভ করল—

"অসম্ভব ভালোলাগায় ক'দিন ঘুমাতে পারিনি, বারবার মনে করবার চেষ্টা করেছি ৩২ বছর আগের তোমাকে। কি অদ্ভুত শিহরনে যে আমার সময়গুলো কেটেছে, সে আর তোমাকে কেমন করে বুঝাবো। আমি নাচব না গান গাইব না গোল্লাছুটের দৌড় লাগিয়ে নিজের আনন্দ প্রকাশ করব, কিছুই বুঝতে না পেরে তোমার ৩২ বছর পরে লেখার প্রথম চিঠির পাতায় পাতায় তাই নিজের মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে লুঠ করে নিতে চাই স্মৃতির অতলান্ত ইতিহাস।

তোমার মুক্তোর মতো হাতের লেখায় কি জাদু ছড়িয়ে আছে জানি না। আমায় কিন্তু নেশার মতো টেনে নিয়ে চলেছে তোমার কথার পরে কথা দিয়ে নিপুণ শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির পরে ছবির মধ্য দিয়ে এক নতুন দিগন্তের দিকে। তুমি লিখেছ, "অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে তোমায় চিঠি লিখতে আমার সুদীর্ঘ ৩২টা বছর কেটে গেল বলে আমার কিন্তু কোনো দুঃখ নেই। বরং নিজেকে ধন্যবাদ জানাই যে শেষ পর্যন্ত আমি এটা করতে পেরেছি। এই পারাটাকে নিশ্চয়ই তুমি উপেক্ষা করে ছোটো বানাতে চাইবে না।"

না আমি তোমাকে ছোটো করতে চাই না। এই ৩২টা বছরের যন্ত্রণাকে কি ছোটো করা যায়? আমরা যারা ছোটো তারাই কেবল অপরকে ছোটো করতে গিয়ে নিজেরাই ছোটো হয়ে যাই। তুমি লিখেছ "চারিদিকে অনেক বাধা অনেক পাঁচিল। একে একে সব বাধা অতিক্রম করে সব পাঁচিল টপকে গন্তব্যে পৌঁছতে সময় লাগবে!" হ্যাঁ লাগবে জুরেখা। আসলে সময়টা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়াটা। আর তুমি সেখানে পৌঁছতে পেরেছ, তাইতো আনন্দের। রাশি রাশি রক্তপলাশ কত মাঘের হিমেল হাওয়াকে অতিক্রম করে আমাকে স্পর্শ করতে চাইছে তা যদি তুমি জানতে!

হয়তো তোমারও বলার আছে যন্ত্রণার দিগন্ত যখন বলাকার স্পর্শে শিহরিত হয়ে ওঠে, সেই আধো সন্ধ্যার গোধুলি ধূসর রক্তিমাভায় বিষণ্ণ চেতনাগুলো যখন আবার পাপড়ি মেলতে চায়, চপল হাওয়ায় এলোচুল যখন কবরীবন্ধনে উন্মুক্ত প্রিয়স্পর্শিত পুষ্পকোরকের জন্য যে অধীর অপেক্ষা, তার বেদনার সুর কি এই সুদীর্ঘ বছরগুলিতে কোনো এক জীবনের বেলাভূমে সমুদ্রের অজস্র ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়েছিল কিনা, অথবা অনুরণিত হয়েছিল কিনা সেই শব্দ ঝংকার যা কেবল বিষণ্ণ সন্ধ্যায় ছায়া অন্ধকারে কোনো মায়াবী জোছনার স্বপ্ন সায়রে শিহরন তোলে।

তোমার ৩২টা বছরের অভিমানী হৃদয়ে জমে উঠেছে যে অজস্র জানার স্পৃহা, নিজেকে উজাড় করে সাজিয়েছ যে নৈবেদ্য, আমার উত্তর তাতে মন ভরবে কিনা, জানি না। কিন্তু জুরেখা, যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র যখন সুর হয়ে বাজে, সে সুরকি যন্ত্রের যন্ত্রীর যন্ত্রণাই তো রূপ পায় লয়-তাল-গানে। জানি না কেমন করে নেবে তুমি আমাকে। তবু বলবার চেষ্টা করব ধীরে ধীরে মনে মনে — ভাষার আকাশকে বিকসিত করে আমার তুলির ছোঁয়ায়।

হ্যাঁ, জুরেখা, তোমার সেদিনের চোখের জলের মূল্য আমি দিতে পারিনি। কিন্তু তুমিও কি পারতে সত্যি যদি আমি মূল্য দিতে চাইতাম তাহলে সব বাধাকে পদদলিত করে আমার সঙ্গে চলে আসতে? আজ তুমি যাই বল না কেন, কিন্তু একথা তো সত্যি, তা তুমি পারতে না। আর পারতে না যে তার প্রমাণ তো এই ৩২বছরের প্রতীক্ষা।

কি চেয়েছিলে তুমি সেদিন? শুধু একটুখানি ভালোবাসা। একটুখানি অনুরাগ মাখা অনুকম্পা? মোটেই তা নয়, কারণ আমি তো উজাড় করে দিতে চেয়েছিলাম সম্পূর্ণ আমাকে তোমার হাতে। কিন্তু মনে পড়ে কি, কি বলেছিলে সেদিন তুমি? বলেছিলে, "আমি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে এই জন্য যে তুমি তোমার সব আমিত্বকে নিঃশেষ করে আমাকে তুমি দিতে চেয়েছ বাংলাদেশের এক নগণ্য মেয়ে হিসাবে এ যে আমার কি পাওনা, সে তুমি বুঝবে না। যে দেশে নারী দিয়েছে নিঃশেষ করে পুরুষের পায়ে অঞ্জলি সেই দেশেরই এক পুরুষ হয়ে সে তার সব অহংকারকে সঁপে

দিয়ে একজন নারীকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছে। যে দেশের পুরুষের স্বভাব হচ্ছে লুণ্ঠন, সেই দেশেরই পুরুষ হয়ে তুমি তোমার পূজার ডালি সাজিয়েছ নৈবেদ্যর হোমাগ্নিতে, তবু আমি অপারগ ছান্দিক। তোমার দেওয়ার ক্ষমতাকে আমি হিংসা করি না। আমি নিতে পারছি না বলে, তোমাকে আমি অপমান করতে পারি না। শুধু আমি বলতে চাই "তুমি যা দিতে চেয়েছ সে তোমারই থাক। নেওয়ার যোগ্য হলে আমি নিজেই একদিন তা চেয়ে নেব।"

আজ এতগুলো বছর পরে তোমার যোগ্যতা-অযোগ্যতার কোনো বিচার না করেও আমি কি জানতে চাইতে পারি না, তুমি নিতে চাইলেও আজ তা আমি দিতে পারব কিনা? একদিন যে হাতে পূজার ডালি সাজিয়েছি, আজ সেই হাত বিষ-জর্জরিত কিনা।

তুমি যেমন তোমার অতীতচারিতায় কোনো ধারাবাহিকতা রাখনি। যখন যেটা যেমনি মনে হয়েছে তাকেই এঁকেছ তোমার তুলিতে, খন্ড খন্ড সেই বিচ্ছিন্নতাকে যুক্ত করলে হয়তো তা পাবে এক সামগ্রিক রূপ, তেমনি নিজেকে তুলে ধরতেও হয়তো কোনো ধারাবাহিকতা থাকবে না, কিন্তু সবকিছু নিয়ে আমিও চেষ্টা করব সেই সামগ্রিকতায় পৌঁছাতে।

না কবে প্রথম তোমাকে আমার ভালো লেগেছিল মনে নেই। অবশ্য তুমি ধরিয়ে দিতে চেয়েছ হৈমন্তী বিকেলের বুকে ধীরে ধীরে নেমে আসা এক ধূসর সন্ধ্যার কথা।

তোমার পায়ের চটিটার ফিতেটা হঠাৎ ছিঁড়ে যাওয়ায় তুমি কি করবে বুঝতে না পেরে কলেজ থেকে একটু দূরে পলাশ গাছটার নিচে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিলে, আমি ফিরছিলাম ওই পথে। এর আগে অবশ্য তোমাকে কয়েকবার দেখেছি যাওয়া আসার পথ চলাতে। সে তো অনেক মেয়েকেই দেখি। তোমাকেও দেখেছি তেমনিভাবে। সেই দেখার মধ্যে ছিল না কোনো আলাদা অনুভূতি।

আমি কলাবিভাগের ছাত্র, আর তুমি ছিলে বিজ্ঞানের ছাত্রী। এমনিতেই দুস্তর ব্যবধান আমাদের মধ্যে। হঠাৎ তোমাকে একাকী ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার পৌরুষ অহংকার তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অবশ্য আদৌ তার কোনো প্রয়োজন তোমার আছে কিনা না জেনেও।

সেদিনের আগে পর্যন্ত আমি তোমার নামই তো জানতাম না, তাই কীভাবে তোমার সাথে কথা বলব ইতস্তত করছি দেখে তুমিই প্রথম বললে, 'আমি জুরেখা, চটিটা ছিঁড়ে গেছে, পায়ে খুব লাগছে, ওই যে পাথরের চাঁই দেখছেন না, অসতর্কে ওতে লেগে রক্তও ঝরেছে বেশ কিছুটা।'

সেই মুহূর্তে তোমাকে ভালো লেগেছিল কিনা জানি না, কিন্তু তোমাকে যে অন্যদের থেকে আলাদা মনে হয়েছিল একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। তুমি তোমার অসহায়তার কথা আর বেশি বলতে পারনি, বা আমিই হয়তো তোমাকে বলতে দিইনি। চেয়ে দেখি, সত্যিই তোমার ডান পায়ের বুড়ো আঙুল হতে তখনো রক্ত ঝরছে। কাঁধের ব্যাগটা রাস্তার পাশে নামিয়ে রেখে নিচু হয়ে তোমার রক্ত ঝরা জায়গায় হাত দিতে গেলে তুমি দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলেছিলে ছিঃ ছিঃ এসব কি করছেন? বাংলাদেশের চিরকালীন নারী সংস্কার, ধর্মের গন্ডীতে তা বাঁধা যায় না জুরেখা!

আমি ডানহাত দিয়ে তোমার ওই রক্তঝরা জায়গাটা চেপে ধরে বাঁ হাত দিয়ে পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমালটা বের করি এবং তাই দিয়ে রক্তটা ভালো করে পরিষ্কার করে রুমালের খানিকটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে জায়গাটাকে ভালো করে জড়িয়ে দিয়েছিলাম আর সেই প্রথম চোখ তুলে তোমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলোম সেফটিপিন থাকলে দিন, চটিটার ফিতে আপাতত লাগিয়ে দিচ্ছি।

এই সাবলীলতা মনে হয় তোমাকে অবাক করেছিল, আর তারই মধ্যে সংকোচ কাটিয়ে উঠে শাড়ির আঁচলের নিচের ব্লাউজের কোনো এক গোপন অংশ থেকে হয়তো সেফটিপিনটা বের করে আমার হাতে দিয়েছিলে, আর আমি তাই দিয়ে ছেঁড়া ফিতেটা জুড়ে চটিটা তোমার হাতে দিয়ে বলেছিলাম, নিন এবার পরে নিন। সামনে কিছুটা এগোলেই বাঁদিকে মুচি পাবেন, প্রথমেই চটিটা সারিয়ে নেবেন। একথা বলার পরে আর অপেক্ষা করিনি। কারণ অন্তত সেদিন তোমার আমার যাওয়ার পথ এক ছিল না। সেদিন তুমি কি ভেবেছিলে আজ আর তা জানার উপায় নেই। কিন্তু এই এত বছর পরেও একথা আমি হলফ করে বলতে পারি যে তোমার পাশে আমার বেশিক্ষণ উপস্থিতি, কিছুতেই চাওনি। আমিও হয়তো চাইনি কারণ, যে সমাজব্যবস্থায় আমাদের অবস্থান, তাতে তাকে অস্বীকার করার কোনো ক্ষমতাই আমাদের ছিল না।

না সেদিন তুমি তোমার অনুচ্চারিত ভাষায় কি বলতে চেয়েছিলে আমি জানি না। পরবর্তীকালে যখন বলার অনেক অবকাশ তুমি পেয়েছিলে, তখনো তুমি তা বলনি। আজ নতুন করে তোমার সেই অনুচ্চারিত কথায় এমনকি নতুন সত্যের সন্ধান পেতে পারি যা তোমার জানতে ইচ্ছে করছে!

থাক সে কথা, মৃত্যুর মধ্যে শান্তি খুঁজতে চেয়েছিলে তুমি তোমার এই কথাটাই তো স্ববিরোধিতায় ভরা অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। তোমার প্রতিটি চিন্তায়, তোমার জীবন ধারণার স্পষ্টতায় তোমার নিজেকে প্রকাশ করতে ভুল হয়নি, যে তুমি জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছ। জীবন তো একটাই, তাকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া অন্যায়, এ অভিব্যক্তি তোমার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বারবার। তবে মৃত্যুতে শান্তি খুঁজতে চাওয়ার যে অভিপ্রায়ের কথা, তোমার নতুন চিন্তায় দ্যোতিত হয়ে উঠেছে, তারমধ্যে তোমার বিশ্বাসের জোর আছে কিনা আমি জানি না, "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে/মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"—পথ চলার নেশায় এ গানের কলি তো তোমার কণ্ঠে শুনেছি বারবার। বরং আমার মোটা আর ধেড়স গলায় যখন বালকের মতো গেয়ে উঠেছি 'মরণরে তুহু মম শ্যাম সমান'—তখন তুমি তোমার অনাবিল হাসির দ্যোতনায় সমস্ত দেহ সুষমাকে দোলায়িত করে মরাল গ্রীবার বাঁকা চাহনিতে সুনীল দৃষ্টি হেণে বলেছ, কবি বলেছেন বটে 'মরণ'। আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন 'জীবন'। আমি বোধহয় কোনো উত্তর দিতে যাব তার আগেই দেখি তুমি হঠাৎ করে পাশের বকুল গাছটির নিচ দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে একটা ভাঙা বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে ইশারায় আমায়ে চলে যেতে বলছ। তারপর ওই ভাঙা দেওয়ালের আড়ালে কখন যেন তুমি অদৃশ্য হয়ে গেলে। পিছনে-সামনে-ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখি কোথায় তো কেউ নেই। তবু তুমি ওইভাবে চলে গেলে কেন? অনেকবার ভেবেছিলাম, নিজেকে অপদস্থ মনে হচ্ছিল, তবু তোমায় কোনোদিন জিজ্ঞাসা করতে পারিনি, কেন তুমি সেদিন ওইভাবে চলে গেলে! মনে মনে আশা ছিল, হয়তো তুমি বলবে কিন্তু তুমিও বলনি, আমারও শোনা হয়নি।

তুমি এক বৈশাখী ঝড়ের কথা মনে করতে চেয়েছ, জানি না এমন করে টুকরো টুকরো অতীতকে তুলে নিয়ে এসে কোন্ ধোঁয়াশায় আমাকে পরীক্ষা করতে চাইছ! আবার তোমার কথার সূত্র ধরে তুমি নিজেই বলেছ টুকরো টুকরো স্মৃতিকে একের পর এক গেঁথে নিয়ে তুমি এক সত্যের ঠিকানায় পৌঁছতে চাও।

সত্যি জুরেখা, অপূর্ব তোমার ভাষার লালিত্য শব্দবিন্যাস আর কল্পনার মণিকাঞ্চন। তুমি যে এ সম্পর্কে অসম্ভব সচেতন, তা প্রকাশ পায় তুমি যখন লিখেছ "জানি তুমি আমায় বলবে এ তোমার কল্পনা বিশ্বাস। ভাষার সূত্রতায় তুমি তাকে বিন্যস্ত করেছ মাত্র।" যাকগে সে কথা।